তারিখ ... 03 FEB 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

অভিমত

লাইব্রেরি ও লাইব্রেরিয়ানের ভূমিকা

মুমিনা দেয়াসিনী

লাইব্রেরি প্রসঙ্গে, বিশেষত স্কুল লাইব্রেরি প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বারবার লিখে বলেছি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা প্রত্যক্ষ করে আবারও সে কথাগুলো না বলে পারছি না। তবে এবারে আমার কিছু প্রশ্নও আছে, শিক্ষানীতি প্রণয়নকারী মন্ত্রণালয়ের কাছে।

এই নীতিমালা প্রণীত পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী দেখতে পাই সরকার প্রদত্ত শর্ত চাহিদা মোতাবেক পূরণ করতে পারলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি অনুমোদন পেয়ে থাকে। এখানে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব, সংখ্যা, পরিমাপসহ যেসব নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত স্থান, পর্যাপ্ত কক্ষ সংখ্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী, বই, লাইব্রেরি, শিক্ষক এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে একজন শরীরচর্চাবিদ শিক্ষকও থাকবেন—যাকে শরীরচর্চা এবং স্কাউট ট্রেনিংপ্রাপ্ত হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিয়ম লাইব্রেরির ক্ষেত্রে কলেজ, মাধ্যমিক স্কুল মাদ্রাসা সবখানেই প্রযোজ্য। তবে কলেজ লাইব্রেরির জন্য লাইব্রেরি সায়ান্সে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন গ্রাজুয়েট লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে; কলেজ লাইব্রেরিতে পঠিত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বইসহ ২০হাজার টাকার বই থাকতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল লাইব্রেরিতেও তাই। তবে এখানে ১০ হাজার টাকার বই থাকতে হবে। মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রকাশিত বা বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যবইসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ পুস্তক এবং রেফারেন্স বই থাকতে হবে।

আমার বক্তব্য হলো, প্রথমত, স্কুল এবং মাদ্রাসায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বইসহ লাইব্রেরি থাকতে হবে বলা হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের কথা বলা হয়নি। তা হলে এ বইগুলোর দেখাশোনা কে করবে? কে লাইব্রেরি পরিচালনা করবে? দ্বিতীয়ত, কলেজে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন গ্রাজুয়েট লাইব্রেরিয়ান হলেই কি একা তার পক্ষে বইপত্র দেখাশোনা করা, লাইব্রেরির আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই লেনদেনসহ লাইব্রেরি পরিচালনা করা সম্ভব? যে কোনো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িত থাকলেও লাইব্রেরি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে বই সংরক্ষণ করা হয়, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পাঠকদের জন্য, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। লাভবান হয় পাঠক এবং প্রতিষ্ঠান। পাঠক জ্ঞানে। প্রতিষ্ঠান সুনামে। লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরি পরিচালনা করেন মাত্র। এখন কথা হলো; যেকোনো প্রতিষ্ঠান—সে যতো ছোটই হোক, এটা কি একটা পরিচালনা করা সম্ভব? যেহেতু লাইব্রেরি একা প্রতিষ্ঠান এবং লাইব্রেরি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার শুরু আছে, শেষ নেই। ১০ হাজার টাকার বই নিয়ে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়ার পরও উত্তরোত্তর বই বাড়তেই থাকবে। এছাড়া লাইব্রেরির বইগুলো শেলফে শুধু সাজিয়ে রাখা হয় না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুছিয়ে রাখা হয়। এই নিয়ম মেনে চলতে বই বাছাই করে কেনা থেকে শেলফে গুছিয়ে তোলা পর্যন্ত যে কার্য পরম্পরা তা বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়। ফলে যেখানে একজনের পক্ষে লাইব্রেরি পরিচালনা করাই সম্ভব নয়, সেখানে লাইব্রেরিয়ান ছাড়া কি করে লাইব্রেরি রাখা সম্ভব তা বোধগম্য নয়। দেশের কোনো স্কুলে লাইব্রেরিয়ানের পদ নেই। যেসব সরকারি স্কুলে পূর্বে ছিল, এনাম কমিটি সেগুলোও লুপ্ত করে দিয়েছে। বোধগম্য নয়—শিক্ষা ব্যবস্থার প্রারম্ভিক স্তরে যদি লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হতে না পারে, উচ্চ-শিক্ষায় লাইব্রেরির গুরুত্ব অনুভব করতে না শিখে তবে তাদের শিক্ষা কতোখানি পূর্ণতা পায়! যেনতেন প্রকারে লাইব্রেরি পরিচালনার মানসিকতা শিক্ষানীতির পরিপন্থী নয় কি?

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় লাইব্রেরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে অভিভাবকগণও তেমন সচেতন নন। তারা তাদের সন্তানদের জন্য স্কুলের চাহিদা মোতাবেক খেয়ে না খেয়ে সমস্ত দাবি মিটিয়ে থাকেন। সেখানে তারা লাইব্রেরি চার্জ বাবদ স্কুলে ভর্তির সময় থেকে প্রতি বছর নিয়মিত একটা ফি দিয়ে থাকেন। অথচ তারা কখনোই খোঁজ নেন না তাদের সন্তান লাইব্রেরির সুবিধা কতোটুকু ভোগ করছে। এই সচেতন অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা চান না তাদের সন্তান পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্য কোনো বই পড়ুক। ফলে শহর কিংবা গ্রাম প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফি বাবদ লব্ধ অর্থ নয় ছয় করে ব্যয় করে—যার কোনো সঠিক হিসাব কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই থাকে না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটিতে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রশ্ন করে গোজামিল দেওয়া জবাব পাওয়া গেছে। আবার অনেকে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে বলে জানিয়েছেন। অথচ আরোপিত নীতিমালা সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ণকারীগণ সচেতন থাকলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গ্রহণীয় লাইব্রেরি ফি থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি অনেকখানিই উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি ফি দেবে অথচ লাইব্রেরি ব্যবহার থেকে বঞ্চিত থাকবে, এটা শিক্ষানীতির কোন ধারায় পড়ে—তাও বোধগম্য নয়।

কথা আরো আছে—যেমন, অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে পদ ছাড়াই লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হয়েছে সেখানে লাইব্রেরিয়ান অন্য শিক্ষকদের মতো সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর কলেজ লাইব্রেরিতে লাইব্রেরি সায়ান্সে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তাহলে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি থেকে প্রতি বছর দুটি ব্যাচে উচ্চ মাধ্যমিক পাস যে শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি সায়ান্সে সার্টিফিকেট কোর্সের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তাদের উপযোগিতা কোথায়? এদের শিক্ষা যদি কোনো কাজেই লাগানো না যায় তবে কেন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে?

লাইব্রেরি আন্দোলনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইউরোপের সামাজিক অবস্থা যখন নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছিল, সমাজবিদগণ তখন লাইব্রেরির মাধ্যমেই মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে এবং ঘরে ঘরে বই সরবরাহ করে তৎকালীন অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোকজনকে বই পড়ায় উৎসাহিত করা হয়েছিল। পাঠক সৃষ্টি এবং পাঠক ধরে রাখার জন্য এক লাইব্রেরি থেকে বই অন্য লাইব্রেরিতে পালাক্রমে বদল করেও সরবরাহ করা হতো। এতে বইয়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও পাঠক এক বই বারবার পড়ার একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পেতো।

এসব অনুসন্ধান থেকে সহজেই অনুমেয় যে পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যবিষয় সহজ পাঠ্য করার জন্য শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি মনস্ক করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই, আর এজন্য প্রয়োজন শিশুশ্রেণী থেকে লাইব্রেরির গোড়াপত্তন করা। অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুলগুলোতেও উপযুক্ত লাইব্রেরি রাখা। যদিও, পুস্তকনীতি প্রণয়নের সময়ে এ প্রসঙ্গটি বাদ পড়ে গেছে, তথাপি আমার মনে হয় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

মুমিনা দেয়াসিনী : লাইব্রেরিয়ান, উদয়ন বিদ্যালয়, ঢাকা। আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি।